ট্রান্স মিয়ানমার গ্যাস পাইপলাইন– কার স্বার্থে?

চলার পথে

নির্মল সেন

'গ্যাস নিতে দেশী-বিদেশী কোম্পানির নতুন চাল– ট্রান্স মিয়ানমার পাইপলাইন।' ২৬ জুনের দৈনিক জনকণ্ঠের খবরটি পড়ে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না। সাম্রাজ্যবাদী চক্র যখন বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস নিতে পারছে না, তখন কি তারা এই কৌশল আবিষ্কার করেছে? খবরটি পড়ে এই কথাটিই বারবার ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম গ্যাস সংকটে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা।

১৮ জুনের একটি দৈনিকের খবরে বলা হয়, 'ভয়াবহ গ্যাস সংকটে বৃহস্পতিবার সাভার ইপিজেড, জয়দেবপুর ও টঙ্গী শিল্প এলাকায় এক হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে তোলপাড় হয়েছে।... পরিস্থিতি সামাল দিতে সন্ধ্যায় লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সারকারখানায় গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দেয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ অচলাবস্থা চলতে থাকলেও গতকাল পরিস্থিতি মারাত্মক হওয়ায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে।' এ খবরটি পড়ে আমার অসুস্থ শরীরটা আরও অসুস্থ হচ্ছিল। আর ভাবছিলাম বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের ভবিষ্যৎ কি? গ্যাস সম্পর্কে এমনিতেই নানা মুনির নানা মত। বর্তমানে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্যাস রফতানি করে করেও করতে পারেনি। নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্য জনগণ পথে নেমেছিল। জনগণের দাবি ও আন্দোলনের মুখে জোট সরকার প্রথম ধাক্কায় সুবিধা করতে পারেনি। তিন তিনটি লংমার্চে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে জানান দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণ আপস করবে না। তাই তো 'জান দেব তো গ্যাস দেব না' স্লোগান দিয়ে জনগণ ঢাকা-সিলেট (মাগুরছড়া), ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-খুলনা-মংলা লংমার্চ সফল করেছে। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে তাদের নতুন কৌশল খুঁজতে শুরু করেছে। ট্রান্স মিয়ানমার গ্যাস পাইপলাইন তাদের সেই নতুন কৌশলের অংশ নয়তো!

আমার কিন্তু ভয় হয়! ২৬ জুনের খবরটিতে বলা হয়েছে, 'দেশী-বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশের গ্যাস রফতানির জন্য নতুন চাল চেলেছে। সর্বশেষ চালটি হচ্ছে– ট্রান্স মিয়ানমার গ্যাস পাইপলাইন। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে মিয়ানমারের গ্যাস বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতে নেয়ার কথা বলা হলেও টার্গেট কার্যত বাংলাদেশের গ্যাস। প্রস্তাবিত পাইপলাইনের মাধ্যমে অনায়াসে যাতে বাংলাদেশের গ্যাস নেয়া যায় সেজন্য আগেভাগেই বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ভিত গড়তে চাচ্ছে ভারত। প্রস্তাবে বাংলাদেশের জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২৮৯ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনায় ৩০ কোটি ডলার বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে। এই বিনিয়োগের ১৫ কোটি ডলারই বাংলাদেশে খরচ হবে। বাংলাদেশ পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহনের হুইলিং চার্জ বাবদ বছরে পাবে ১০ কোটি ডলার বলে লোভ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ওই পাইপলাইন পরিচালনা-ব্যবস্থাপনা থেকেও বাংলাদেশী কোম্পানি জিটিসিএল ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার আয় করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে গ্যাস নিয়ে অর্থাৎ গ্যাসের উৎপাদন-অনুসন্ধান, রফতানি ও সরবরাহ নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। এ বিতর্ক দীর্ঘদিনের। যে সরকারই ক্ষমতায় আসে সে-ই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অসম চুক্তি করে দেশের সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। নিজেদের পকেট ভারী করে। যদিও এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকারের আমল থেকে। ১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকার ৪টি উৎপাদন বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে ৫টি এবং ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ৯টি উৎপাদন বণ্টন চুক্তির মাধ্যম ১১টি গ্যাস ব্লকের ইজারা দেয়। ক্ষতিকর শর্তে বিদেশী কোম্পানিকে ৯টি প্রাইভেট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির লুণ্ঠনের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ২৩টি অনুসন্ধান ব্লকে ভাগ করা হয়। এমনকি ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন সিলেটের মাগুরছড়ায় অক্সিডেন্টাল কোম্পানির অবহেলায় কূপ খননের সময় ব্লো-আউটের ফলে মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ১ টিসিএফ গ্যাস পুড়ে যায়। ১৭৬ কোটি টাকার বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। এ দুর্ঘটনার পর অক্সিডেন্টাল এদেশ ছেড়ে চলে যায়। ইউনোকল তাদের সব দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে উদ্যোগী হয়নি। শোনা যাচ্ছে, বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী নাকি এর বিরুদ্ধে মামলা করবেন। 'বিস্ফোরণের সাত বছরের মাথায় কোন ক্ষতিপূরণ তো পাওয়াই যায়নি। উল্টো ইউনোকল মাগুরছড়ায় গ্যাস কূপ খননের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে' (১৪ জুন, ২০০৪ প্রথম আলো)। অন্যদিকে 'দেশের ১৬ নং ব্লকের সাঙ্গু ফিল্ডের আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এক পাইপলাইন ব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে একটি মামলায় হেরে যাওয়ার পর এখন বিদেশী তেল-গ্যাস কোম্পানি কেয়ার্ন এনার্জিকে (শেল) ২ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের প্রায় ১৩৮ কোটি পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেট্রোবাংলা' (১৮ জুন ২০০৪, দৈনিক ইত্তেফাক)। অস্পষ্ট উৎপাদন বণ্টন চুক্তি ও কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতার কারণেই বিশাল অংকের এ অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশী কোম্পানির হাতে। অথচ বাপেক্সের দক্ষ ১১০০ জনবল কাজে লাগানো হচ্ছে না।

এত ভুল আর এত জরিমানার পরও কি আমাদের কর্তাব্যক্তিদের হুঁশ হবে না। তাহলে আমরা কি 'নিজেদের ধন পরকে দিয়ে, নিজেরা বেড়াব ঢনঢনিয়ে'? অবস্থা তো এখন তাই দাঁড়াচ্ছে। একদিকে "মারাত্মক গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাসভিত্তিক শিল্প বাণিজ্যে গ্যাস কানেকশন বন্ধ! দেড় শতাধিক শিল্পে গ্যাস কানেকশনের আবেদন ফাইলবন্দি হয়ে আছে দীর্ঘদিন। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলো গ্যাস সংকটের অজুহাতে কানেকশন দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও তিতাসে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্যাস সংযোগ বন্ধে সরকারের ঘোষণা না থাকলেও এ ব্যাপারে 'গো স্লো' নীতির কারণে সম্ভাবনাময় শিল্পগুলো চালু হচ্ছে না" (২১ জুন, ২০০৪ জনকণ্ঠ)। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন বলেছেন, বিদ্যমান সংকট মোকাবিলা নিয়েই আমরা ব্যস্ত। সুতরাং শিল্প স্থাপন করেই গ্যাস চাইলে দেয়া অসম্ভব। অন্যদিকে আমাদের গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য আছে বলে মনে হয় না। যদিও 'সম্প্রতি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভায় বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ২২টি গ্যাসক্ষেত্রে এ মুহূর্তে উত্তোলনযোগ্য ১৫ দশমিক ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাস মজুদ রয়েছে' (১৪ জুন ২০০৪, প্রথম আলো)। সর্বশেষ এক জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ২০ দশমিক ৪২০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। আবার কতিপয় বিশেষজ্ঞ মনে করছেন আমাদের সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ ১১ দশমিক ৬৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে কেউ সঠিক কোন তথ্য দিতে পারছেন না। গ্যাস রফতানি নিয়ে সরকারের যুক্তির যেন শেষ নেই। অথচ গ্যাসের দৈনিক চাহিদাই পূরণ করতে পারছেন না। এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশের ১২টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫২টি কূপ থেকে প্রতিদিন ১৩০ কোটি ৯০ লাখ ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়। যা দেশে সর্বোচ্চ চাহিদা দৈনিক ১ হাজার ৪৭৭ মিলিয়নের চেয়ে অনেক কম। এছাড়া অসম উৎপাদন বণ্টন চুক্তি ও বেসরকারি বিদেশী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীনে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে। অথচ নিজস্ব বিনিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে করলে বছরে সর্বাধিক ২০০-৩০০ কোটি টাকা খরচ হতো বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সরকার আর একটি ভুল করেছে গত বছর আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দামের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের নামে বিশ্বব্যাংকের 'জ্বালানি প্রাইসিং ফর্মুলা' অনুযায়ী তাদের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে। যার ফলে ইতিমধ্যে দু'দফা গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ জুলাই থেকে আরেক দফা গ্যাসের দাম অর্থাৎ ৫.৭৭ শতাংশ হারে

বেড়েছে। গ্যাসের দাম বাড়লে তেলের দামও বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বিদ্যুৎ এবং পানির দামও। জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে লাভ হল কার? দফায় দফায় গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি আঘাত হানবে রুগ্ন দেশীয় শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, আবাসিক গ্রাহক, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে। এ বিষয়টি আমাদের সরকার কি কখনও ভেবে দেখেছে? ভেবে দেখলে ভাল হতো নাকি?

দেশে যখন চলছে তীব্র গ্যাস সংকট তখন এই সংবাদটি আমাকে বিস্মিত করেছে, ব্যথিত করেছে। ট্রান্স মিয়ানমার গ্যাস পাইপলাইন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দেখা দেবে না তো? লোভ আর কলা-মুলোর বেড়াজালে আমাদের সরকার আটকে যাবে না তো? সরকার কি করবে তা সরকারের ব্যাপার। কিন্তু জনগণ চায় ট্রান্স মিয়ানমার গ্যাস পাইপলাইন হলে এই চুক্তির সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-অলাভের হিসাব যেন গোপন না থাকে। প্রকাশ্যে যেন তা বলা হয়। দেশের সার্বিক স্বার্থ যেন রক্ষা পায়। এর ব্যত্যয় হলে জনগণ কিন্তু আর ঘরে বসে থাকবে না। দেশের মানুষ দেশের সম্পদ রক্ষার জন্য যে তিন তিনটা সফল লংমার্চ করেছে প্রয়োজনে এর চেয়েও কঠিন পদক্ষেপ নেবে। তবু দেশের সম্পদ হাতছাড়া হতে দেবে না।

১.৭.২০০৪

গুলশান আখতার

জলজট-যানজট-অবরুদ্ধ ঢাকা

দারুণ অগ্নিবাণেরে হৃদয় তৃষায় হানেরে– গ্রীষ্মের দাবদাহে দগ্ধ তৃষিত মানুষের প্রাণে শীতল পরশ বুলায় বর্ষা। কবিগুরু তো আছেনই, বর্ষা বন্দনায় মুখর বাংলার তাবৎ কবি-সাহিত্যিক। সেই প্রাচীন বর্ষামঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে আজ অবধি। গ্রীষ্মের খরতাপে ধূলিধূসর প্রকৃতি বর্ষার বারিধারায় স্নাত হলে হয়ে ওঠে সবুজ-শ্যামল আর স্নিগ্ধ।

বর্ষা অনেকেরই প্রিয় ঋতু। কাঙ্ক্ষিত ঋতু। কিন্তু ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের কাছে ইদানীং বর্ষা হয়ে উঠেছে যেন মূর্তিমান অভিশাপ। দশ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হলেই রাজধানীবাসীর দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বর্ষা মৌসুম শুরু হতে না হতেই রাজধানী শহরের জলাবদ্ধতা সমস্যা হয়ে উঠেছে প্রকট। বৃষ্টি বেশি হলেই নগরীর প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলি-গলি পর্যন্ত পানি থৈ থৈ করে। ঢাকা ওয়াসা এবং ডিসিসি বিগত বছরগুলোতে রাজধানীর জলাবদ্ধতার এক নম্বর কারণ হিসেবে পলিথিনকে দায়ী করত। এখন পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির মৌসুমে রাজধানীতে দুঃসহ জলাবদ্ধতার চিত্রের হেরফের হয়নি। মৌচাক-মালিবাগের জলাবদ্ধতা এই রাস্তায় নিয়মিত চলাচলকারী যাত্রীদের কাছে আতংক বৈ কিছু নয়। মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতেই মালিবাগ থেকে মৌচাকে তো বটেই এবার কমলাপুর পর্যন্ত থৈ থৈ পানিতে রাস্তাঘাট ডুবে থাকতে দেখা গেছে। উত্তরা-মতিঝিল রুটের বাসযাত্রীদের জলাবদ্ধতার কারণে কর্মস্থলে অথবা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে এমনকি দুই থেকে আড়াই ঘণ্টাও লেগে যায়। জলজটে পড়ে দ্রুত ও মন্থর গতির যানগুলো একই সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে। যানজট এমনিতেই নগর জীবনকে স্থবির করে দিচ্ছে। এর ওপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই জলাবদ্ধতা। বর্ষার সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় ও সুযোগ কোথায় ঢাকাবাসীর? যানজট-জলজটে পড়ে মানুষের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে ওয়াসা ও ডিসিসি রাজধানীবাসীকে আশ্বাস দেয় যে, সামনের বছর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু সেই সামনের বছরটি আসলে কোন বছর তা ঢাকাবাসী বুঝে উঠতে পারছে না। কেবল পরিকল্পনা আর আশ্বাসের মায়াজাল ছড়িয়ে নগরবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা সব সরকারের আমলেই দেখা যায়। যখনই দশ মিলিমিটারের ওপর বৃষ্টিপাত হয় তখনই কর্মজীবী মানুষ স্রষ্টার নাম জপতে থাকেন। এমনকি এখন নগরীর অভিজাত এলাকাগুলোতেও জলজট আর যানজটের ভয়াবহতা দেখা যাচ্ছে। উত্তরা ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকা হলেও রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। শহরের মাত্রাতিরিক্ত কোলাহল থেকে কিছুটা নিভৃতে অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে উত্তরাবাসী স্বপ্নের নীড় গড়েছেন। কিন্তু বর্তমানে ডিসিসির নানা অব্যবস্থাপনার শিকার উত্তরাবাসী। রাস্তায় উপচে পড়া ময়লা-আবর্জনা, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থার কারণে উত্তরাতেও একটু বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন পয়েন্টে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যানবাহন চলাচলে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা। এ চিত্র গুলশান, বনানী ও ধানমণ্ডিতেও কম-বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রবল বর্ষণে নগরীর অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় ঘরের ভেতর পর্যন্ত পানি উঠে যায়। রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় লোকজন বর্ষা মৌসুমে পানির সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বলাই বাহুল্য, এই পানি নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে কোন কোন এলাকার দরিদ্র কর্মজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। নোংরা পানি ঠেলে কর্মসংস্থান করতে গিয়ে অনেকেই বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। এদিকে বর্ষা মৌসুমে ভাঙাচোরা রাস্তার খানাখন্দে, ড্রেনে জমে থাকা পানিতে মশককুল মহানন্দে বংশ বিস্তার করছে। পত্রপত্রিকায় ডেঙ্গুর অশনি সংকেত পাচ্ছি আমরা। বর্ষা ইদানীং নগরবাসীর জন্য কেবল জলাবদ্ধতার আতঙ্কই সৃষ্টি করছে না– মশা ও পানিবাহিত নানা রোগব্যাধি দুঃস্বপ্নের মতো মানুষের ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। ডিএনডি বাঁধ এলাকার প্রায় ৪ লাখ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকার বৃষ্টির পানি ও ড্রেনের পানি মিশে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নগরীর পানি নিষ্কাশনের প্রধান পথ ওয়াসার স্টর্ম স্যুয়ারেজ। অলিগলি থেকে সিটি কর্পোরেশনের সারফেস ড্রেন বা পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি এই স্টর্ম স্যুয়ারেজ লাইনে আসে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ডিসিসির সারফেস ড্রেন আছে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার, ৬ হাজার সুইপারকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগের ওপর সারফেস ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যদিও এই দায়িত্ব কখনও ঠিকভাবে পালিত হয় না। নগরীর অধিকাংশ সারফেস ড্রেন মাটি ও আবর্জনা দিয়ে বন্ধ হয়ে আছে। এখন পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত না হলেও ডাবের খোসাসহ কঠিন বর্জ্য ওয়াসার স্টর্ম স্যুয়ারেজ লাইনে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া যখন তখন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কারণে মাটি ও আবর্জনার স্তূপ জমে ড্রেনেজ সিস্টেম অচল করে দিচ্ছে। নাগরিকদের অসচেতনতা ও ডিসিসির বর্জ্য অপসারণে গাফিলতি মূলত এজন্য দায়ী। প্রকৃতির ওপর যথেচ্ছাচারের শাস্তিও পাচ্ছে মহানগরবাসী। একসময় ধোলাইখাল, মতিঝিল ও আরামবাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালসহ অন্যান্য খাল ও নালাপথে পানি নেমে যেত। এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে দ্রুত পানি নিকাশ হতো। ধোলাইখাল ভরাট করে মোটা পাইপ বসানো হয়েছে। অভিযোগ আছে, এই মোটা পাইপ দিয়ে মাঝারি বর্ষণের পানিও নামছে না। সেই সঙ্গে হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে নগর সম্প্রসারণ। ঢাকা মহানগরীর স্যুয়ারেজ লাইনের মধ্যে বেশির ভাগই ডিসিসির দায়িত্বে। তবে বড় লাইনগুলো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ওয়াসার। ছোট ও সারফেস লাইনগুলোর দায়িত্ব ডিসিসির। বলাই বাহুল্য, এই দুই সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয় নেই। এছাড়াও ওয়াসা, ডেসা ও টিঅ্যান্ডটির মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে যখন তখন রাস্তা খোঁড়া মহানগরীর কালচারে পরিণত হয়েছে। মহানগরীর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নিচু এলাকার খোঁজ-খবর ডিসিসি ও ওয়াসা কর্তৃপক্ষ রাখে কিনা সন্দেহ। বাসাবো, শান্তিবাগ, কদমতলা, মাদারটেক, নন্দীপাড়া, গোড়ান, খিলগাঁও, মেরাদিয়া এলাকায় বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে পানি ও কাদা মাটিতে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসব এলাকায় ওয়াসার স্টর্ম স্যুয়ারেজ সিস্টেম নেই। ড্রেনেজ ব্যবস্থাও নেই সবখানে। যেটুকু আছে সেটুকুও বর্জ্য অব্যবস্থাপনার শিকার। এলাকার কর্মজীবী মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাকভেজা হয়ে ময়লা নোংরা পানিতে যখন তখন রিকশা উল্টে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যে যেতে হয়। জলাবদ্ধতার কারণে যানজটের নগরী বলে ইতিমধ্যেই খ্যাত ঢাকা বর্ষা মৌসুমে যে কি ভয়াবহ যানজটের শিকার হয় সে কথা শুধু ভুক্তভোগী অধিবাসীই জানেন। জলজটের সময় সবচেয়ে বিপাকে পড়ে রিকশাযাত্রীরা। মহানগরীতে কয়েক লাখ অবৈধ রিকশা যে যানজটের অন্যতম কারণ তা আজ কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রাম থেকে আসা কর্মহীন নিরক্ষর মানুষের স্রোত ঠেকানো না

গেলে রিকশার সংখ্যা আরও বাড়বে বৈ কমবে না। এসব রিকশাচালক ট্রাফিক আইনের ধার ধারে না। দ্রুত ও মন্থর গতির যানের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। রাজধানীর কোন কোন অংশে তথাকথিত বিউটিফিকেশনের নামে জনগণের কষ্টার্জিত সম্পদ অকাতরে ব্যয় করা হচ্ছে। কেটে ফেলা হচ্ছে প্রকৃতির নান্দনিক সম্পদ হাজার হাজার বৃক্ষরাজি। অথচ মহানগরীর মূল সমস্যা বিশেষ করে জলাবদ্ধতা, রাস্তা সংস্কার ও যানজট নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলো থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। আরও কিছু সমস্যা যেগুলো মহানগরের অধিবাসীদের কুরে কুরে খাচ্ছে তা হচ্ছে অপরিসর নগরীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, রাস্তা অনুপাতে মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন (লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা যানও রয়েছে প্রচুর), অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর নির্মাণ, অনুন্নত, অপ্রতুল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, ঘুষখোর ট্রাফিক পুলিশ, অদক্ষ গাড়ি চালক, পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্যের স্তূপ, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশ ইত্যাদি। এসব সাংবাৎসরিক সমস্যার সঙ্গে বর্ষাকালে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো যুক্ত হচ্ছে জলাবদ্ধতা। মহানগরীতে বর্ষা ও জলাবদ্ধতা এখন সমার্থক বলা যায়। যানজট ও জলজটে পড়ে অসহায় মানুষ যখন খাবি খাচ্ছে তখন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বিউটিফিকেশন হচ্ছে নগরীর নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। এদিকে ওয়াসারও অভিযোগ আছে অর্থে সংকট নিয়ে। ড্রেনেজ সিস্টেম আধুনিক করতে এবং সচল রাখতে যে পরিমাণ অর্থ দরকার ওয়াসার সেই অর্থ নেই। ওয়াসাকে সে অর্থ জোগান দেয়া খুবই জরুরি। জলবদ্ধতার জন্য দায়ী কারণগুলো এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ দক্ষ তাদের দিয়েই শনাক্ত করা উচিত। প্রয়োজন হলে এ সমস্যা নিরসনে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হতে পারে। জনমত আহ্বান করা যেতে পারে। একটি কার্যকর গবেষণা সেল হওয়াও জরুরি। বিষয়গুলো যেন কেবল পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বিভিন্ন অব্যবস্থায় অতিষ্ঠ ঢাকাবাসী সুন্দর-স্বচ্ছন্দ নগরজীবনের স্বপ্ন দেখেছে দীর্ঘকাল ধরে। এজন্য পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়নই তারা আশা করে। মহানগরীর শোভাবর্ধনের নামে হাজার কোটি টাকার শ্রাদ্ধ না করে ঢাকাবাসীদের মূল সমস্যাগুলোর সমাধানই আগেভাগে করতে হবে। জলাবদ্ধতা, যানজট যে রাজধানীর প্রধান দুটি সমস্যা সে কথা কি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে? বিশেষ করে এই বর্ষা মৌসুমে!